দৈনিক জনকন্ঠ
ডিসেম্বর ২৪, ২০১০
পৃষ্ঠা – ০৫
০৭০.৪০৮
শ্রেণীসংখ্যা – ~~৬১৫.~~২

নকল ও ভেজাল ওষুধ হতে সাবধান

ডা. মুনীরউদ্দিন আহমদ

জনকন্ঠ
২৪.১২.১০
পৃ. ৫

জীবনরক্ষার নামে নকল, ভেজাল ও মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধে বাজার ছেয়ে গেছে। নকল ও ভেজাল ওষুধ বাজারজাত করায় শুধু জটিল রোগ-ব্যাধি নয়, ঘটছে মৃত্যুর মতো ঘটনাও। সারাদেশে ২৪৬টি ওষুধ কোম্পানি প্রায় ২০ হাজার ব্র্যান্ডের ওষুধ উৎপাদন করছে। এর মধ্যে অধিকাংশ ব্র্যান্ডের ওষুধই ওষুধ প্রশাসনের কোনো ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই অবাধে বাজারে বিক্রি হচ্ছে। বছরে প্রায় আড়াই শ কোটি টাকার ওষুধ নকল হচ্ছে। সারাদেশে এ্যালোপ্যাথিক, আয়ুর্বেদিক ইউনানী ও হোমিওপ্যাথিকসহ ৮শ'র বেশি ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থাকলেও এদের মধ্যে প্রায় ৭শ প্রতিষ্ঠানই নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ তৈরি করছে। ফলে রোগীরা আর্থিক ক্ষতির পাশাপাশি গুরুতর শারীরিক ক্ষতিরও শিকার হচ্ছেন। দেশে বছরে ওষুধ বিক্রি হচ্ছে ৫ হাজার কোটি টাকার। এর মধ্যে আড়াই শ কোটি টাকার ওষুধ ভেজাল হচ্ছে। ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ কোম্পানিই ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ তৈরি করছে। চিকিৎসকদের মতে, এসব ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় প্রাণহানিরও আশঙ্কা রয়েছে। ওষুধ প্রশাসন অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, দেশে বর্তমানে ২৪৬টি এ্যালোপ্যাথিক, ২২৪টি আয়ুর্বেদিক, ২৯৫টি ইউনানী ও ৭৭টি হোমিওপ্যাথিকসহ ৮৪২টি ওষুধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এছাড়াও ওষুধ তৈরি হচ্ছে জিঞ্জিরা, কামরাঙ্গীরচর, হাজারীবাগ, লালবাগ, ইসলামবাগ, মীরহাজীরবাগ, জিগাতলা, মালিবাগ, যাত্রাবাড়ী, ডেমরা, বাড্ডা, সাভার ও টঙ্গীতে। এর মধ্যে বড়জোর ৪০ থেকে ৫০টি ছাড়া বাকি প্রতিষ্ঠানগুলো নকল ও নিম্নমানের ওষুধ তৈরি করেছে। সূত্র জানায়, দেশে প্রায় সোয়া দুই লাখ ওষুধের দোকান রয়েছে। এর মধ্যে লাইসেন্স রয়েছে মাত্র ৬০ হাজার দোকানের। অবশিষ্টগুলোর কোনো লাইসেন্স নেই। ফলে তারা অবাধে নকল ওষুধ বিক্রি করছে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব মতে বিশ্বের মোট ওষুধ উৎপাদনের ১০ শতাংশ হলো নকল ও ভেজাল ওষুধ।

উন্নয়নশীল দেশগুলো বিশেষ করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে নকল-ভেজাল ওষুধের অপ্রতিরোধ্য দৌরাত্ম্য চলছে। এসব দেশে নকল ওষুধ উৎপাদনের কারখানা রয়েছে। এই অঞ্চল থেকে নকল ওষুধ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চোরাচালান হয়। ১৯৯৯ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বিশ্বের ২০টি দেশ থেকে ৪৬টি গোপনীয় রিপোর্ট সংগ্রহ করে। এসব রিপোর্টের ৬০ শতাংশ সংগ্রহ করা হয় উন্নয়নশীল দেশ থেকে এবং উন্নত দেশ থেকে মেয়াদোত্তীর্ণ ও নিম্নমানের ওষুধ ছিল অধিকাংশ। ১৯৯৫ সালে নাইজার মেনিঞ্জাইটিস মহামারী প্রতিরোধে পার্শ্ববর্তী দেশ নাইজিরিয়া থেকে ৮৮ হাজার ভ্যাকসিন ডোনেশন পায়। পরীক্ষায় দেখা যায়, এসব ভ্যাকসিনে কোন মূল উপাদান ছিল না। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, ৬০ হাজার মানুষকে এই নকল ভ্যাকসিন প্রদান করা হয়েছিল। দক্ষিণ-আমেরিকার দেশ মেক্সিকোতে প্রতিবছর প্রায় ৬শ'৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের নকল ও ভেজাল ওষুধের ব্যবসা হয়। এই ব্যবসা দেশের মোট ওষুধ ব্যবসার প্রায় ১০ শতাংশ। প্রিয় পাঠক, আসুন এবার দেখি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে নকল ও ভেজাল ওষুধের দৌরাত্ম্য কেমন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০০১ সালের হিসেব মতে, বিশ্বের মোট নকল ও ভেজাল ওষুধের ৩৫ শতাংশ শুধু ভারতেই উৎপাদন হয়। নকল ও ভেজাল ওষুধ উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে নাইজিরিয়া (২৩ শতাংশ)। ভারতে ৪ হাজার কোটি টাকার নকল ও ভেজাল ওষুধ উৎপাদন ও বিক্রি হয় যা মোট ওষুধ উৎপাদনের ২০ শতাংশ।

এবার বাংলাদেশের নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধ নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

বাংলাদেশের মোট ওষুধ উৎপাদনের কত শতাংশ নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের সে সম্পর্কে আমার হাতে কোন তথ্য নেই। তবে বিভিন্ন রিপোর্ট বা তথ্যবিবরণীতে বাংলাদেশে নকল, ভেজাল ও ক্ষতিকর ওষুধের রমরমা ব্যবসার কথা প্রায়ই প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের বেশিরভাগ ছোট ছোট কোম্পানি নকল ও ভেজাল ওষুধ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সঙ্গে জড়িত বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। ওষুধ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত পরীক্ষায় দেখা গেছে, দেশীয় কিছু কোম্পানির উৎপাদিত ৭০ শতাংশ প্যারাসিটামল এবং ৮০ শতাংশ এ্যাম্পিসিলিন ক্যাপসুল নিম্নমানের। ২০০৪ সালে পরীক্ষিত ৫ হাজার ওষুধের মধ্যে ৩০০ ওষুধ নকল, ভেজাল বা নিম্নমানের বলে শনাক্ত করা হয়। উদ্বেগের বিষয় হলো, এসব ওষুধের মধ্যে ছিল অত্যাবশ্যকীয় এ্যান্টিবায়োটিক এবং জীবনরক্ষাকারী ওষুধ।

১৯৯৯ সালে ৬৫১৭ টি ওষুধের মধ্যে ১০২টি নকল, ভেজাল বা নিম্নমানের ওষুধ ছিল। সাম্প্রতিককালে পরীক্ষিত ৪৭ শতাংশ সিপ্রোফ্লাসিনে পর্যাপ্ত মূল উপাদানের পরিবর্তে অনেক কম পরিমাণ মূল উপাদান ব্যবহার করার তথ্য বেরিয়ে আসে। এছাড়াও ওষুধের বাজারে রয়েছে মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধের ছড়াছড়ি। এসব নকল, ভেজাল, নিম্নমান এবং মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধের করাল গ্রাসে শহরের মানুষের চেয়ে গ্রাম বা মফস্বলের মানুষই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। কারণ মফস্বলে আইন প্রয়োগকারী

> “ বাংলাদেশের বেশিরভাগ ছোট ছোট কোম্পানি নকল ও ভেজাল ওষুধ উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সঙ্গে জড়িত বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়

থেকে এবং উন্নত দেশ থেকে আসে বাকি ৪০ শতাংশ রিপোর্ট। রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নকল ও ভেজাল ওষুধকে ৬ ভাগে ভাগ করে। এক, পরীক্ষায় দেখা গেছে, ৩২.১ শতাংশ ওষুধে আদৌ কোন মূল উপাদান নেই। দুই, অপর্যাপ্ত পরিমাণ মূল উপাদান ব্যবহার করা হয়েছে ২০.২ শতাংশ ওষুধে। তিন, ২১.৪ শতাংশ ওষুধে ব্যবহার করা হয়েছে ভুল উপাদান। চার, ১৫.৬ শতাংশ ওষুধে ঠিক মূল উপাদান ব্যবহার করা হলেও তাদের মোড়ক ছিল নকল। পাঁচ, এক শতাংশ ওষুধ তৈরি হয় আসল ওষুধকে হুবহু অনুকরণ করার মাধ্যমে এবং ছয়, ৮.৫ শতাংশ ওষুধে পাওয়া গেছে দূষিত ও ক্ষতিকর উপাদান। পরিসংখানে দেখা গেছে, মোট ওষুধ বিক্রির ১৫ শতাংশ হলো নকল ও ভেজাল । আফ্রিকা ও এশিয়ায় এ ধরনের ওষুধের পরিমাণ হলো ৫০ শতাংশ। নকল ও ভেজাল ওষুধের ব্যবসার পরিমাণ প্রায় ৩ হাজার ৫শ' কোটি মার্কিন ডলার (আনুমানিক ২ লাখ ৪০ হাজার কোটি টাকা)। ২০০৪ সালে ফুড এ্যান্ড ড্রাগ অথরিটি (এফডিএ) যুক্তরাষ্ট্রে ৫৮টি নকল ও ভেজাল ওষুধ শনাক্ত করে। ২০০৩ সালে এই ধরনের ওষুধের সংখ্যা ছিল ৩০টি। ১৯৯০ সালের পর থেকে প্রতি বছর মাত্র ৫টি নকল ওষুধ শনাক্ত করা যেত। ২০০৪ সালে বিশ্বে নকল ও ভেজাল ওষুধের ব্যবসার মোট পরিমাণ ছিল ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (আনুমানিক ২ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা)। ২০১০ সাল নাগাদ এই অবৈধ ব্যবসার পরিমাণ দাঁড়াবে ৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে (আনুমানিক ৫ লাখ ২৫ হাজার কোটি টাকা)। প্রিয় পাঠক, আপনাদের একটু মনে করিয়ে দেই, বাংলাদেশের এক বছরের বাজেট আনুমানিক মাত্র ৭০ হাজার কোটি টাকা।

উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশগুলোর জন্য নকল ও ভেজাল ওষুধ এক ভয়ঙ্কর সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। হেপারিনের কথা তো আগে বলা হলো। হেপারিন জীবনরক্ষাকারী ওষুধ। আসল ওষধের পরিবর্তে নকল হেপারিন প্রয়োগ করলে জীবন যেতে পারে। এবার আরো একটি ওষুধের কথা বলি। আমাদের মতো দেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ অত্যন্ত বেশি। অথচ নকল ম্যালেরিয়ার ওষুধের কারণে হাজার হাজার মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় নকল ও ভেজাল ম্যালেরিয়ার ওষুধের কারণে প্রতিবছর এক লাখ মানুষ মারা যায়। আনুমানিক এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধেক ম্যালেরিয়ার ওষুধ আর্টিসুনেট ট্যাবলেটে আদৌ কোন মূল উপাদান পাওয়া যায়নি। কাইজার কোম্পানির ওষুধ লিপিটর (এ্যাটরভ্যাস্টেটিন) রক্তে কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইড কমানোর ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর। ২০০৫ সালে বিশ্বব্যাপী এই ওষুধটির বিক্রির পরিমাণ ছিল ১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (আনুমানিক ৮৪ হাজার কোটি টাকা)। প্রচন্ড কাটতির কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই ওষুধের নকল ব্যবসা শুরু হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কানসাস শহরে এক দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ী লিপিটর নকল ও বাজারজাত করার জন্য ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করে। ২০০৫ সালে এই গোপন ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ৩ ব্যক্তিকে আটক করা হয়। ২০০৩ সালে ২৪ লাখ পাউন্ডের নকল ভায়াগ্রা ট্যাবলেট আটক করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের এক দুর্নীতিবাজ ব্যবসায়ী চীন থেকে নকল ভায়াগ্রা আমদানি এবং যুক্তরাষ্ট্রে ৭ লাখ নকল ভায়াগ্রা উৎপাদন করার কথা স্বীকার করে।

বিশ্বের বেশিরভাগ নকল ও ভেজাল ওষুধের উৎপাদন হয় এশিয়াতে। মূলত চীনেই উৎপন্ন হয় এসব ওষুধের সিংহভাগ। ২০০১ সালে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়, চীনে প্রায় ৫শ' অবৈধ ওষুধ কারখানা রয়েছে। ২০০১ সালে চীনে ১ লাখ ৯২ হাজার মানুষ নকল ও ভেজাল ওষুধ খেয়ে মারা যাবার পর কর্তৃপক্ষ ৪ লাখ ৮০ হাজার ভুয়া ওষুধ শনাক্তপূর্বক ১৩শ' ওষুধ কোম্প্যানি বন্ধ করে দেয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব মতে কম্বোডিয়াতে কম করে হলেও ২ হাজার ৮শ' দুর্নীতিবাজ ওষুধ ব্যবসায়ী রয়েছে। ২০০৩ সালে কম্বোডিয়ায় এক হাজার নকল ও ভেজাল ওষুধ আটক করা হয়। প্রপাইলিন গ্লাইকলের পরিবর্তে বিষাক্ত ডাই-ইথালিন গ্লাইকল ব্যবহার করার কারণে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ, হাইতি, নাইজিরিয়া, ভারত ও আর্জেন্টিনাতে পাঁচ শতাধিক শিশু মারা যায়। ২০০২ সালে নাইজেরিয়া ভারত থেকে যত ওষুধ আমদানি করে তার ৬০ শতাংশ ছিল নকল, ভেজাল ও ক্ষতিকর। এসব ওষুধের মধ্যে

মফস্বলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। নকল, ভেজাল বা নিম্নমানের ওষুধ গ্রহণের ফলে শরীরে সৃষ্ট প্রতিক্রিয়ার কারণে অনেক সময় নানা ধরনের বিভ্রান্তি দেখা দেয়। এসব বিভ্রান্তির কারণে মূল কালপ্রিট নকল, ভেজাল বা ক্ষতিকর ওষুধের পরিবর্তে আমরা আমাদের স্বাস্থ্যের অবনতি বা মৃত্যুর জন্য অন্যসব নির্দোষ উপাদানকে দায়ী করে বসি। ওষুধ যখন সেবন করা হয় তখন বোঝার উপায় থাকে না এটি নকল বা আসল। ওষুধ সেবনের পর কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া না গেলে রোগী ভাবে তার রোগ নির্ণয় ঠিক হয়নি। তখন রোগী অন্য ডাক্তারের কাছে যায়, বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন করতে গিয়ে আর্থিকভাবে সর্বস্বান্ত হয়। নকল, ভেজাল ওষুধের কারণে শরীরে কোন বিষক্রিয়া বা ক্ষতিকর অবস্থার সৃষ্টি হলে তাকে ওষুধের এলার্জিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করে রোগীকে অন্য ওষুধ প্রদান করা হয়। মূল দোষী সেই সকল ভেজাল ওষুধটি বরাবরই দৃষ্টির বাইরে থেকে যায়। অনেক ক্ষেত্রে নকল-ভেজাল- ক্ষতিকর ওষুধের কারণে কারো স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটলে বা মৃত্যু হলে দোষ হয় রোগের, নতুবা ডাক্তারের অথবা হাসপাতালের। আমরা খুব কমই ভাবি নকল, ভেজাল, নিম্নমানের ওষুদের কারণে বিশ্বের অধিকাংশ রোগী মারা যায়। তাই এসব নকল, ভেজাল ও নিম্নমানের ওষুধের করালগ্রাস থেকে আমাদের বাঁচতে হবে। কিভাবে বাঁচা যায় তার ওপর এবার কিছু পরামর্শ শোনা যাক।

এক. যেসব ওষুধের দোকানে অভিজ্ঞ ফার্মাসিস্ট বা চিকিৎসক নেই, সেসব দোকান থেকে ওষুধ না কেনাই ভাল।

দুই. ওষুধ কেনার পর ক্যাশমেমো গ্রহণ করুন। ক্যাশমেমো ছাড়া কোন ওষুধ কিনবেন না। ওষুধ বিক্রেতাকে ক্যাশমেমো দিতে বাধ্য করুন।

তিন. ক্যাশমেমোর ওপর পরিষ্কারভাবে ওষুধের নাম, ব্যাচ নম্বর ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ লেখা হয়েছে কি না পরীক্ষা করে দেখুন। ওষুধের ব্যাচ নম্বর, মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ লেখা না হলে ক্যাশমেমো গ্রহণ করবেন না। ক্যাশমেমোতে পরিষ্কারভাবে ওষুধের দাম লেখা থাকা চাই।

চার. ক্যাশমেমোতে ওষুধের জেনেরিক নাম লেখা হলে ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানির নাম উল্লেখ করতে হবে।

পাঁচ. প্রেসক্রিপশনে চিকিৎসক যে সব ওষুধ লিখেছেন, ঠিক সে ওষুধটি কিনুন। ওষুধ বিক্রেতা প্রেসক্রিপশনে প্রদত্ত ওষুধের পরিবর্তে অন্য ওষুধ দিতে চাইলে যাচাই না করে কিনবেন না। কারণ, ওষুধ বিক্রেতা বিকল্প ওষুধের নামে নকল, ভেজাল বা নিম্নমানের ওষুধ বিক্রি করে আপনাকে ঠকাতে পারে।

ছয়. খোলা বা খুচরা ওষুধ কেনার ব্যাপারে সতর্ক হোন। খোলা ওষুধ নকল, ভেজাল বা নিম্নমানের হতে পারে।

সাত. ওষুধের প্যাকেট বা মোড়কের ওপর মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ দেখে ওষুধ কিনুন। মোড়কের ভেতরে ওষুধের প্রত্যেকটি স্ট্রিপে এই তারিখ মুদ্রিত থাকে। কৌটার ওষুধ বা শিশির ওষুধ কেনার সময় ভাল করে দেখে নিন, সীল অক্ষত আছে কি না।

আট. ওষুধের মোড়কের গায়ে খুচরা মূল্য, ব্যাচ নম্বর ও মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ লেখা থাকে। ওষুধ কেনার আগে এসব তথ্য পরীক্ষা করে দেখুন। লিখিত মূল্যের কম দামে ওষুধ বিক্রি হলে ওষুধ নকল বা ভেজাল হতে পারে।

নয়. অনেক ওষুধের নামের উচ্চারণ অত্যন্ত কাছাকাছি। পরীক্ষা করে দেখুন আপনি ঠিক ওষুধটি গ্রহণ করছেন কি না।

দশ. ওষুধের লেবেল ক্ষতিগ্রস্ত, নষ্ট বা পুরনো হলে ঐ ওষুধ কিনবেন না।

এগারো. যারা অশিক্ষিত বা পড়াশোনা কম তাদের ওষুধ কেনার সময় শিক্ষিত বা অভিজ্ঞ লোকের সাহায্য নেয়া বাঞ্ছনীয়। ক্রেতা অশিক্ষিত হলে বিক্রেতা এর সুযোগ নিতে পারে।

বারো. ওষুধ ব্যবহারের পর লেবেল, ওষুধের কৌটা বা শিশি, মোড়ক ধ্বংস করে ফেলুন। ডিপোজেবল সিরিঞ্জ বা গ্লাভস ব্যবহারের পর ধ্বংস করে ফেলুন যাতে করে অসৎ ব্যবসায়ীরা এগুলো রিপ্যাক করে বাজারজাত করতে না পারে।

লেখক : প্রফেসর, ক্লিনিক্যাল ফার্মেসি ও ফার্মাকোলজি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
drmuniruddin@yahoo.com